ভয়ঙ্কর + ধুরন্ধর
গাজী কামরুল কাহিনী

যশোর থেকে **মামুন রহমান**

খুলনার দৌলতপুর থানার ভয়ঙ্কর এক জনপদের নাম আড়ংঘাটা। স্বজনহারা মানুষের দীর্ঘশ্বাস আর একের পর এক বিভীষিকাময় ঘটনা দেখে দেখে সবাই যেন পাথর হয়ে গেছে। অন্তত পৌনে একশ' হত্যাকান্ডের বীভৎস ঘটনা যে গ্রামে ঘটে তাদের মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে? সেই গ্রামেই আজ থেকে ৪ বছর আগে ঘটে আরো একটি নারকীয় ঘটনা। গভীর রাতে (২৫ আগস্ট ২০০০) স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের দ্রিম দ্রিম শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যায়। অজানা আশঙ্কায় ভয়ে আঁতকে ওঠেন অনেকেই। আবার বারবার লাশ দেখতে দেখতে পাথর হয়ে যাওয়া লোকজন গুলির আওয়াজ বুঝেই ভিড় জমান ঐ গ্রামের মকছেদ ডিলারের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে সবাই থ' হয়ে যান। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বাড়ির ছাদ। তার মধ্যে পড়ে আছে তরতাজা ৫ যুবকের লাশ। এ বর্বরতা কিভাবে সম্ভব? লাশ দেখে সবাই চিনতে পারে। তারা হলো- খুলনার এক শীর্ষ সন্ত্রাসী আকতার হোসেন খোকন ওরফে টাইগার খোকনের ক্যাডার রহিম, ইব্রাহিম, পোড়া খোকন, দুলাল ও আসাদুল। সবাই একই দল করে। তাহলে ছাদের ওপর উঠে তাদের মারলো কে? এ ব্যাপারে সাবার আগে যে নামটি উচ্চারিত হয় তার নাম গাজী কামরুল। টাইগার খোকনের প্রধান প্রতিপক্ষ। এ হত্যাকান্ডের রহস্যটিও এক সময় জানাজানি হয়ে যায়। টাইগার খোকনের ৫ ক্যাডার মূলত

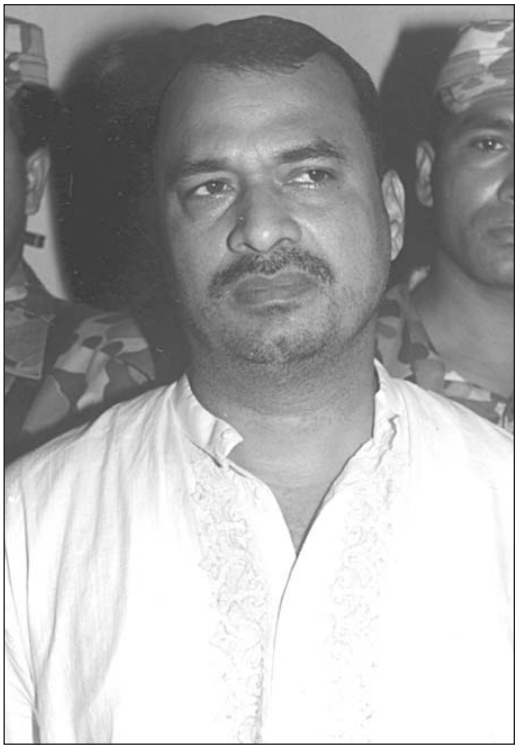

সমবেত হয়েছিল গাজী কামরুলকেই খতম করে দিতে। পরিকল্পনা মতই তারা জড়ো হয় ঐ বাড়ির ছাদে। তারপর অপারেশন পূর্ব কিছু খানাপিনার আয়োজন করা হয়। খাসি ভুনা, ইলিশ ভাজা আর রঙিন পানীয় দিয়ে আয়োজন করা হয় জমজমাট আসরের। খানাপিনা শেষে সবাই যেন নেতিয়ে পড়ে, ঘুম আসে। গভীর ঘুমে মগ্ন হয় সবাই। ঐ ঘুমের ঘোরেই ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হয় ৫ ক্যাডারকে। মূলত এ হত্যাকান্ডটি ছিল পরিকল্পিত। যে কারণে গাজী কামরুলকে হত্যা করতে এসে তারা নিজেরাই নিহত হয়ে যায়। ধুরন্ধর গাজী কামরুলের বিশাল নেটওয়ার্ক আর বুদ্ধির কাছে হেরে যায় টাইগার খোকনের ৫ ক্যাডার। তারা যে মিশনের পরিকল্পনা করেছিলো তা আগেভাগেই ফাঁস হয়ে যায়। জেনে যায় গাজী কামরুল। তার পরিকল্পনা মতেই ৫ ক্যাডারকে খাদ্যের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়। তারপর তাদের ওপর চালানো হয় উল্টো অপারেশন। শুধু ঐ ৫ ক্যাডার নয়, বুদ্ধি আর কৌশলের কারণে স্বয়ং টাইগার খোকনও পারেনি গাজী কামরুলের সঙ্গে। যে কারণে দুই বডিগার্ডসহ তাকেও নির্মমভাবে খুন হতে হয়। আর আসামি হলেও গাজী কামরুলসহ তার দলবল ঐ মামলায় বেকসুর খালাস পায় ২০০০ সালের ২৯ নবেম্বর। সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে খুলনার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের তৎকালীন বিচারক এম. হাসান ইমাম মামলার ১৬ আসামিকেই বেকসুর খালাস দেন। তবে এবার ধরা খেয়ে গেছে আন্ডার ওয়ার্ল্ডের এই জীবন্ত কিং। তবে এর নেপথ্যেও রয়েছে অনেক রহস্য।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটলে সরকার ১৯ জুলাই থেকে এ অঞ্চলে যৌথ বাহিনী নামায়। কিন্তু কৌশলগত নানা কারণে এ অভিযানটি নামসর্বস্ব অভিযানে পরিণত হয়। অভিযানের ধরন আর ফলাফল দেখে লোকজন যখন হাসাহাসি করতে থাকে আর সরকারের উচ্চ মহল হয় হতাশ, ঠিক তখনি চমক দেখায় যৌথ বাহিনী। অভিযানের ২২তম দিনে (১০ আগস্ট) তারা ধরে ফেলে সরকার ঘোষিত ১৬০ শীর্ষ সন্ত্রাসীর একজন গাজী কামরুলকে। দৌলতপুরের দেয়ানাস্থ বাড়ি থেকেই তাকে আটক করা হয়। তবে খুব সহজে নয়, এজন্য ঘাম ঝরাতে হয় তাদের। নিশ্চিত তথ্যের ওপর ভর করে অভিযান চালিয়েও প্রথম দফার তল্লাশিতে তাকে পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় দফার তল্লাশিতে ধরা পড়ে যায় গাজী কামরুল। অবশ্য এ নিয়েও এখন অনেক কথা উঠছে।

উত্থান কাহিনী

সব শীর্ষ চরমপন্থী-দুর্বৃত্তের উত্থান কাহিনী যেমন চমকপ্রদ, গাজী কামরুলেরও ঠিক তাই। মূলত প্রতিশোধস্পৃহা থেকেই তার এ জগতে পদার্পণ। বর্তমান রক্তাক্ত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে গাজী কামরুলের নিবাস দৌলতপুরের দেয়ানা-আড়ংঘাটা এলাকায় চরমপন্থীদের আধিপত্য ছিল সত্তর দশকের শুরু থেকেই। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি বা ইপিসিপি চারু মজুমদারের শ্রেণীশত্রু খতমের লাইন গ্রহণ করলে ঐ অঞ্চলে তৎপর পার্টির নেতা-কর্মীরা গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তি ও আওয়ামী লীগ নেতা রুহুল আমিনকে জোতদার হিসেব শ্রেণীশত্রুর তালিকাভুক্ত করে মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করে। কিন্তু রুহুল আমিন স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়ায় ওই মুহূর্তে তাকে খতম করা সম্ভব হয়নি। তবে

যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দিনের মধ্যেই চরমপন্থীরা রুহুলের ছেলে বাবলু এবং পরবর্তীতে তার বৃদ্ধ পিতা শরমত উল্লাহকে হত্যা করে। এভাবে আড়ংঘাটা-দেয়ানা এলাকায় তাদের হাতে খুন হয় নুরোল, রমজান, এবাদত, সরোয়ার, উজির শেখসহ আরো কয়েকজন। ইপিসিপি নেতা হাশেম ঢালী এসব হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করলে পার্টি তারও মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করে এবং তার পিতা হাতেম ঢালীসহ তাকে হত্যা করে। এরপর আরো খুন হয় মাস্টার বখতিয়ার, মোমিন ফকির ও রফিক। দেশ স্বাধীনের পর এলাকায় ফিরে রুহুল পিতা, পুত্র আর অন্যদের মৃত্যুর খবর শুনে শোকে ভেঙে পড়ে এবং এর বদলা নেয়ার অঙ্গীকার করে। এক পর্যায়ে সে ফুলবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। পরে নিজেই গড়ে তোলে বিশাল একটি বাহিনী। রুহুল বাহিনী হিসেবেই বাহিনী পরিচিতি লাভ করে। ওই বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে প্রাণ হারায় পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডার রেজাউল। এ সময় পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যায় অপর ক্যাডার আশরাফ। অভিযোগ রয়েছে, পালিয়ে যাওয়া আশরাফ ও তার লোকজন ১৯৭৩ সালের ১৯ জুন ফুলবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সামনেই চেয়ারম্যান রুহুল আমীনকে হত্যা করে। এর প্রতিশোধ হিসেবে রুহুল বাহিনীর হাতে খুন হয় আশরাফ ও তার সহযোগী সাফায়াত হোসেন। রুহুল আমীনের পক্ষে নেতৃত্বে থাকে ওলিয়ার ও আনিসুর রহমান।

তাদের হাতে এক পর্যায়ে খুন হয় দেয়ানার সিরাজ গাজরী লোক তপন। এই হত্যাকান্ডের পর আবার নতুন করে রক্তাক্তের অধ্যায় শুরু হয় দেয়ানা-আড়ংঘাটায়। গাজী গ্রুপের লোকের প্রাণহানির ঘটনায় তারা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। কারণ তাদেরও ছিল একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। গাজী করতো বিত্রনপি। এলাকায় তারও ব্যাপক দাপট ও আধিপত্য ছিল। সেই সঙ্গে ছিল চোরাচালানের ব্যবসা। আইয়ুব কমিশনার নামে আরো একজনকে সঙ্গে নিয়ে সে মংলা বন্দরে একটি চোরাচালান সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করতো বলে ব্যাপক প্রচার রয়েছে। এছাড়া খুলনার মিকশিমিল এলাকার ভাগবাটোয়ারা ও সম্পদ- সম্পত্তির দখল নিয়ে তার অপর একটি গ্রুপের সঙ্গে বিরোধ ছিল। এই গ্রুপের নেতৃত্ব দিতো আরেক বিএনপি নেতা আকতার হোসেন খোকন ওরফে টাইগার খোকন। ঠিক এ অবস্থায় সিরাজ গাজীর লোক তপন খুন হলে তার লোকজন হত্যা করে নিহত চেয়ারম্যান রুহুলের আরেক ছেলে লাভকে। এর বদলা নেয়ার জন্য লাভের ছোট ভাই ডাবলু গঠন করে আরেকটি বাহিনী। সিরাজ গাজীর সঙ্গে বিরোধ থাকায় টাইগার খোকন গ্রুপ ডাবলু গ্রুপকে সহায়তা করতে থাকে। টাইগার খোকন

মূলত এরপর থেকেই গাজী কামরুল বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বনে যান। হত্যা-পাল্টা হত্যার ঘটনাও বাড়তে থাকে। চেয়ারম্যান প্রার্থী ইমরান গাজী খুন হওয়ার পর এই হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী আব্দুল হাইকেও হত্যা করা হয়। এই ২ হত্যাকান্ডের বদলা হিসেবে গাজী গ্রুপ হত্যা করে ডাবলু বাহিনী প্রধান ডাবলুকে (১৯৯৪ সালে)। ডাবলু খুন হলে তার বন্ধু টাইগার খোকন বদলা নেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তার বাহিনী হত্যা করে গাজী কামরুলের এক ভাই খোকন গাজীকে

গ্রুপের সঙ্গে সখ্য ছিল পূর্ববাংলার কমিউনিস্টি পার্টির। আপদে-বিপদে তারাই তাকে সহায়তা করতো। টাইগার গ্রুপের সহায়তা পেয়ে তারা সিরাজ গাজীকে হত্যার শপথ নেয়। লাভের হত্যাকারী সন্দেহে এই গ্রুপের হাতে নিহত হন চেয়ারম্যান প্রার্থী ইমরান গাজী (২৪ ডিসেম্বর '৯১)। এভাবে গাজী গ্রুপের লাশ পড়তে দেখে ময়দানে নামে সিরাজ গাজীর ছোট ভাই গাজী কামরুল। কামরুলই হাল ধরে বাহিনীর টাইগার খোকন গ্রুপের পূর্ববাংলাদের সঙ্গে সখ্য থাকায় সে চেষ্টা করে বিপ্লবীদের সঙ্গে সখ্য গড়ার। কিন্তু তার সে চেষ্টা বিফলে যায়। ঐ সময় পার্টির ঐ অঞ্চলের নেতা মনোরঞ্জন হোসাই ওরফে মৃণাল তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ধুরন্ধর গাজী কামরুল হাল ছাড়েনি। সে বিভিন্ন কৌশলে নিজের কম পরিচিত ২ ক্যাডারকে ঢুকিয়ে দেয় বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টিতে। পরিকল্পনা মোতাবেক তার ঐ ২ ক্যাডার মৃণালের ২টি অস্ত্র নিয়ে সটকে পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও মৃণাল তাদের নাগালে পেতে ব্যর্থ হয়। ঠিক এ অবস্থায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গাজী কামরুল মৃণালকে প্রস্তাব দেয় যদি বলে, তাহলে অস্ত্রসহ চোটকারী দু'জনকে তার সামনে হাজির করার চেষ্টা করতে পারে। মৃণাল সে প্রস্তাবে রাজি হলে গাজী কামরুল ২ অস্ত্রসহ তার ২ সাগরেদকে নিয়ে হাজির হয় মৃণালের ডেরায়। তবে সে আগেই অস্ত্র লুটকারী দু'জনের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে নেয়। গাজী কামরুলের ফাঁদ বুঝতে না পেরে মৃণাল তাকে খুব ক্ষমতাধর ভেবে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। মূলত এরপর থেকেই গাজী কামরুল বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বনে যান। হত্যা-পাল্টা হত্যার ঘটনাও বাড়তে থাকে। চেয়ারম্যান প্রার্থী ইমরান গাজী খুন হওয়ার পর এই হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী আব্দুল হাইকেও হত্যা করা হয়। এই ২ হত্যাকান্ডের বদলা হিসেবে গাজী গ্রুপ হত্যা করে ডাবলু বাহিনী প্রধান ডাবলুকে (১৯৯৪ সালে)। ডাবলু খুন হলে তার বন্ধু টাইগার খোকন বদলা নেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তার বাহিনী হত্যা করে গাজী কামরুলের এক ভাই খোকন গাজীকে। এভাবে টাইগার খোকন গ্রুপ গাজী গ্রুপের আনিস মেম্বার, অজিত, মনিরুল, রুহুলসহ অপর একজন, জাকির গাজী, স্বপন, সুশান্ত, মোহনসহ আরো কয়েকজনকে হত্যা করে। অপরদিকে গাজী গ্রুপের হাতে স্বয়ং নিহত হয় টাইগার খোকন বাহিনীর প্রধান আকতার হোসেন খোকনসহ তার সহযোগী আইউব, কামাল, লিটন, গহর, জামিম (খোকনের ভাই), রহিম, ইব্রা, পোড়া খোকন, দুলাল, আসাদুল, রফিকুল, শান্ত, হানিফ, এমদাদ, কুদ্দুস ও স্বপন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দেশ স্বাধীনের পর এই অঞ্চলে অন্তত ৭০ থেকে ৭৫ জন খুন হয়েছে। যার মধ্যে খোকন গ্রুপেরই রয়েছে কমপক্ষে ৩০ জন। গাজী গ্রুপেরও প্রায় সমানসংখ্যক লোক প্রাণ হারায়, তবে তারা বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন অবস্থায় থাকায় খুনোখুনি বন্ধ হয়ে গেছে। টাইগার খোকন নিহত হওয়ার পর তার বাহিনীর আর কেউ শক্ত হাতে হাল ধরেনি। যে কারণে এলাকায় একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করে গাজী গ্রুপ। তবে এক পর্যায়ে গাজীর উত্থানের অন্যতম শক্তি মৃণালের সঙ্গে তার বিরোধ বেধে যাওয়ায় বেশ কয়েক বছর সে ব্যাপক নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে চলাফেরা করতে। গত বছর অপারেশন 'ক্লিন হার্ট' চলাকালেও তাদের মধ্যে সখ্য ছিল। ঐ সময় তারা ডুমুরিয়া অঞ্চলের দুর্গম এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন ঘেরে থাকতো। কিন্তু অপারেশন ক্লিন হার্ট শেষ হলে গাজী কামরুল পুনরায় এলাকায় ফিরে আসে। এরপর দৌলতপুর থেকে মান্নানসহ তার অপর এক সহযোগী নিখোঁজ হয়ে গেলে দু'জনের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এরপর ঠিক একই অবস্থায় মৃণাল গ্রুপের সাকাওয়াত দেহরক্ষীসহ নিখোঁজ হলে দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। একে অন্যকে ঘায়েল করতে মরিয়া হয়ে

ওঠে। এ অবস্থায় গাজী কামরুল ভাগিয়ে আনে মৃণালের এক ঘনিষ্ঠ সহচর জব্বার বাহিনী প্রধান জব্বারকে। তাকে দিয়েই গাজী কামরুল মৃণালের বিরুদ্ধে দাঁড় করায় পাল্টা একটি বাহিনী। ওই জব্বার যৌথ বাহিনীর অভিযানের মধ্যেই খুন হয়। গাজী কামরুলের লোকজনই তাকে হত্যা করে। তবে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মৃণালের লোকজনও জব্বারকে হত্যা করতে পারে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব বিষয় নিয়েই আন্ডারওয়ার্ল্ডের ২ শীর্ষ ক্যাডারের মধ্যে সম্পর্ক চরম আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরু হলে একজন অপরজনকে ধরিয়ে দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। অভিযোগ রয়েছে আর সে কারণেই শীর্ষ তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও গাজী কামরুলকে আত্মগোপন করতে হয়নি। নিজ বাড়িতেই থাকতো সে। যৌথ বাহিনীও কোনো দিন তার বাড়িতে অভিযান চালায়নি। এর কারণ হিসেবে জানা যায়, গাজী কামরুল মৃণালকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য যৌথ বাহিনীর সোর্স হিসেবে কাজ করছিলো।

সত্যতা যাচাই করা সম্ভব না হলেও খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এক্ষেত্রে যৌথ বাহিনী কৌশলের আশ্রয় নিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চেষ্টা করে। মৃণালকে ধরাই ছিল তাদের প্রধান টার্গেট। গাজী কামরুলের দেয়া তথ্যমতে যৌথ বাহিনী ডুমুরিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে মৃণাল সন্দেহে একজনকে আটকও করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায় আটক ব্যক্তি মৃণাল নয়। অন্যদিকে সরকারের উচ্চমহলে যৌথ বাহিনীর অভিযান সংকুচিত করতে থাকে। এ অবস্থায় আর মৃণালকে ধরা সম্ভব নয় ভেবেই তাদের টার্গেট অনুযায়ী ১০ আগস্ট গ্রেপ্তার করে গাজী কামরুলকে। তবে দৌলতপুর-খুলনাঞ্চলে এখনো প্রচার রয়েছে; চরম পরিণতি এড়াতে গাজী কামরুল নিজেই গ্রেপ্তার হয়েছে। কারণ অব্যাহত 'বেইমানি' আর তার দলের লোকজনকে ধরে গুম করে দেয়ার অভিযোগে মৃণাল তার মৃত্যুদন্ড জারি করেছিলো। মৃণালের দক্ষিণহস্ত জব্বার খুন হওয়ার পর গাজী কামরুল আরো বেশি জীবনশাঙ্কায় ভুগতে থাকে।

শেষ কথা

গাজী কামরুল গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাকে দৌলতপুরের বিএনপি নেতা ইকবাল হত্যা মামলায় রিমান্ডে নেয়া হয়। ১৩ আগস্ট দৌলতপুর থানার পুলিশ তার দেয়া তথ্যমতে একই এলাকার হাতকাটা সিজারের বাড়ি থেকে একটি কাটা বন্দুক ও একটি বিদেশী রিভলবার উদ্ধার করে। কিন্তু গাজী কামরুলের অধীনে যে বিমাল অস্ত্র ভান্ডার রয়েছে তার একটিও উদ্ধার করতে পারেনি। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, গাজী কামরুলের দখলে কমপক্ষে দুটি একে-৪৭, ২১টি বন্দুক, ৯টি রাইফেল, ৪টি স্টেনগান, ৯টি পিস্তল ও ১১টি রিভলবার রয়েছে। এর মধ্যে আড়ংঘাটায় প্রতিপক্ষের ৫ জনকে হত্যা করে সংগ্রহ করা হয় ১১টি অস্ত্র। উল্লেখ্য, আন্ডারওয়ার্ল্ডের শীর্ষ এই গডফাদার ১৯৯৯ সালের ৩০ জুন একটি স্টেনগান ও তার সহযোগীরা ৭টি বন্দুক জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু আত্মসমর্পণের পর জেলে থাকলেও গাজী কামরুলের দাপট কমেনি।

কারাগারে বসেই সে তার অপরাধ রাজত্ব চালাতো। এভাবেই সে অন্তত ১০টি মামলা থেকে খালাস পেয়েছে। মামলার বাদীপক্ষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে সাক্ষী দেয়া থেকে বিরত রাখা অথবা এফিডেভিট করিয়ে নিয়েছে। এরপর এখনো তার বিরুদ্ধে হত্যাসহ অন্তত একজন মামলা রয়েছে। কিন্তু তাতে কি! এর পর আবার গাজী কামরুল মুক্ত আলো-বাতাসে ফিরে আসবে, এমনটাই আশঙ্কা করছেন ওই এলাকার মানুষ। কারণ মামলার তদন্ত চার্জশিট প্রদান সবই তো করবে দৌলতপুর থানার পুলিশ। তারা তো তার কথা মতোই চলতো। গাজী কামরুলকে ধরে দৌলতপুর থানায় নেয়া হলে লজ্জায় অনেক পুলিশ কর্মকর্তাই নাকি তার সামনে যায়নি।

এছাড়াও রয়েছে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা। ধুরন্ধর গাজী কামরুল যখন যে দল ক্ষমতায় এসেছে তখনই সে দল করেছে। এরশাদ আমলে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তার গভীর সখ্য ছিল। তারপর বিএনপি ক্ষমতায় এলে সে সখ্য গড়ে তোলে বিএনপির প্রভাবশালী নেতা-কর্মীদের সঙ্গে। বিগত আওয়ামী লীগ আমলে সে ছিল খাঁটি আওয়ামী লীগার। এমনকি আত্মসমর্পনের সময় সাবেক ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী তালুকদার আব্দুল খালেকের হাতে স্টেনগান তুলে দিয়ে গাজী কামরুল জয় বাংলা বলে বক্তব্য শেষ করেছিল। এরপর বর্তমান চারদলীয় জোট ক্ষমতায় এলে গাজী কামরুল আবার সখ্য গড়ে তোলে জোট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। দু'টি কারণে নাকি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা তাকে না করতে পারেন না।

তাহলো অগাধ অর্থ-সম্পদ আর লোকবল। এছাড়া কোনো কোনো নেতা প্রাণের ভয়েও তার কথা মানতে বাধ্য হন। এসব ভেবেই সাধারণ মানুষ খুব একটা আশায় বুক বাঁধতে পারছেন না।

তাই তারা তার মুক্তির দাবি করছেন। পালন করছেন ধর্মঘট।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

ছোট হিন্দু ফ্যামেলি সাবলেট, শ্যামলী রিংরোড।– 9123716, 9136638, Ext-109

***

শুধুমাত্র ফোনে বন্ধুত্বে আগ্রহী অখন্ড অবসরের বিবাহিতা মহিলারা লিখুন।– ডা. অয়ন, বক্স-২৯১ সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

আমার একটাই গন্তব্য ছিলো, তুমি তোমারও গন্তব্য আছে তাই বারবার তোমাকে হারাই। ভুলপথে ক্লান্ত হই, নিজের অজ্ঞাতে বারবার নিজের দরজায় এসে দাঁড়াই এবং আমার একটাই গন্তব্য থাকে, তুমি। সেই তোমাকে, যদি বিবাহিতা অথচ নিঃসঙ্গ, একাকী হও, তবে ফোনে অথবা চিঠির মাধ্যমে (টেলিফোন নম্বরসহ) বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ রইলো।– জিয়া, ০১৭১-১০০৬৬০, পোঃ বক্স নং-২৯৮, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা

***

দেশ ও বিদেশে অবস্থানরত বুয়েটের গ্র্যাজুয়েট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়াররা আমাকে লিখুন। দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত ফেনী জেলার লোকদেরকে আমাকে লেখার আহ্বান জানাচ্ছি। অন্যান্য জেলার লোকেরাও লিখুন। একটা টেলিফোন নম্বর দেবেন। পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও অন্যান্য দেশে যারা রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন ও চাইবেন তারা আমাকে লিখুন। অস্ট্রিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশীদের সঙ্গেও যোগাযোগ চাচ্ছি। আমি দেশবাসীকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমার ছেলের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে কিছু Mechanical ও Electrical & Electronics Engineering-এর British ও American বই দিতে চাচ্ছি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।– Advertiser, P.o. Box 97, A1202 Vienna, Austria

***

সময় গড়িয়ে যায়, হয় সে সুদূরের পানে নয় সে আপন মনে, সময়ের হাত ধরে তাই জানাই ভালো মনের বান্ধবীকে আহ্বান।– হাসান, বক্স-২৯৯, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

***

বিশ্ব ফ্রেন্ডশিপ ডে উপলক্ষে কাছে-দূরের সব বন্ধুদের জানাই উষ্ণ ভালোবাসা এবং বৃষ্টিস্নাত কদমের শতশুভ্র শুভেচ্ছা।– পারভেজ/অপু, আবুল খায়ের গ্রুপ, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম, মোবাইল-০১১০৫৮৭৫৯

***

রোজীকে বলছি, যোগাযোগ করো। ০১৭১-৯০৮৫৫০

***